গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১৬ - ২২ মার্চ ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মহামিছিলে জনজোয়ার

আশায় আবেগে একাত্ম মহানগরী

কৃষিজমি রক্ষার ধারাবাহিক আন্দোলনের একটি ধাপ হিসাবে ৯ মার্চ কলকাতার বুকে এস ইউ সি আই আহূত মহামিছিল কার্যত ভাসিয়ে নিয়ে গেল মহানগরকে, আবেগে-আনন্দে-প্রেরণায় উদ্বেল করে তুলল শহরের নাগরিকদের। হেদুয়া থেকে ধর্মতলা— তেজোদ্দীপ্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এই জনস্রোতকে যাঁরা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন, বাড়ির দোতলা-তিনতলার বারান্দায়, ছাদে দাঁড়িয়ে করতালিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাঁদের চোখ-মুখে ফুটে ওঠা আবেগঘন অভিব্যক্তিই বলে দিয়েছে, এই মহামিছিলের প্রভাব জনজীবনে কেমন ছিল। মিছিলের বিশালত্ব, অংশগ্রহণকারী মানুষের চেতনা, শৃঙ্খলা, স্লোগানের উচ্চকিত কণ্ঠ, উচ্চারণের দৃঢ়তা, নিপুণ হাতের সজ্জা— যা মিছিলকে প্রকৃত অর্থেই মহামিছিলে পরিণত করেছিল, এ সবই পথচলতি ব্যস্ত মানুষকেও পথের ধারে থমকে দিয়েছে; পথচলতি প্রতিটি মানুষ এবং পথপার্শ্বস্থ দোকানদাররা ভিড় করে মিছিল দেখেছেন। মিছিল ভেঙে রাস্তা পার হওয়ার ব্যস্ততা প্রায় কেউই দেখাননি, বরং দাঁড়িয়ে থাকা অনেকেই শশব্যস্ত হয়ে আপন উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় নেমে পড়েছেন, পাশের মানুষকে বুঝিয়েছেন এই মিছিলের তাৎপর্য, এস ইউ সি আই দলের সংগ্রামী চরিত্র ও জমিরক্ষার আন্দোলনে এই দলের সংগ্রামী ভূমিকা। মিছিলের ধারে পথে দাঁড়িয়ে এক যুবক ফোনে বলছিলেন, ''মিছিলে আটকে গেছি। কাজটা পণ্ড হল ঠিকই, তবে দেখছি একসেলেন্ট, চমৎকার।'' ''কোনদিন দাঁড়িয়ে এমনভাবে মিছিল দেখিনি; এ এক ঐতিহাসিক মিছিল। কাল নিশ্চয়ই খবরের কাগজে এ কথাটা লিখবে''। বউবাজার মোড়ে এক যুবকের এই কথাগুলির উত্তরে সম্মতি জানান তাঁর বন্ধুটি। তখনও তিনি জানতেন না, মিছিল যত বিশালই হোক না কেন, পরের দিনের অধিকাংশ কাগজেই যেমন তার কোনও প্রতিফলন থাকবে না, তেমনই অধিকাংশ টিভি চ্যানেলও এ সম্বন্ধে নীরব থাকবে। এক হিন্দিভাষী যুবক তাঁর সঙ্গীকে বলেছেন, ''অ্যায়সা কভি নেহি দেখা''। শুধু এঁরাই নন, ৯ মার্চের কলকাতা মহানগরী সাক্ষী হয়ে থাকল এক ঐতিহাসিক মিছিলের। যেমন গণআন্দোলনের ইতিহাসে, তেমনই মহানগরীর মানুষের মনে বহুদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে এ মিছিল।

কত মানুষ এসেছিলেন এই মিছিলে ? রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখতে থাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে তর্ক করেছেন। কেউ বলেছেন, এক লক্ষ, কেউ বলেছেন, দেড় লক্ষ ; সংবাদ প্রতিদিন লিখেছে, ৭০ হাজার।

এই মিছিলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর সহ সর্বত্র উর্বর কৃষিজমি দখল ও কৃষক হত্যার প্রতিবাদে এবং পতিত ও অনুর্বর জমিতে শিল্পস্থাপন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বন্ধ কারখানা খোলার জন্য রাজ্যের মানুষের দাবিতে জনমত গড়ে তুলতে, শোষিত মানুষকে গণআন্দোলনে সামিল করতে এক কোটি গণস্বাক্ষর নিয়ে মহামিছিলের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে প্রত্যন্তে যেমন এস ইউ সি আই কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন, তেমনই এই স্বাক্ষর সংগ্রহে সামিল হয়েছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। রাজ্যে বোধহয় এমন কোন হাটবাজার, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ছিল না যেখানে কর্মী-স্বেচ্ছাসেবকরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করেননি; গ্রাম-শহরের প্রতিটি পাড়ায়, বস্তিতে, কলে-কারখানায়, স্কুলে-কলেজে, অফিসে-আদালতে সর্বত্র মানুষ ভিড় করে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এই ভিড়ে যেমন শ্রমিক-কৃষক, দরিদ্র সাধারণ মানুষ ছিলেন, তেমনই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীরাও। তাঁরা শুধু স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণাও ব্যক্ত করেছেন। জেনে নিয়েছেন মিছিল কখন, কোথা থেকে শুরু হবে, তারপর মিছিলে যোগ দেওয়ার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে স্বাক্ষর সংগ্রহের ফর্ম চেয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের উদ্যোগে স্বাক্ষর করিয়ে দিয়েছেন। সিপিএমের বহু কর্মী-সমর্থক নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েই ফর্মে স্বাক্ষর দিয়ে গিয়েছেন এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা

চারের পাতায় দেখুন

৯ মার্চ ১ কোটি ২১ লক্ষ ৩৫ হাজারেরও বেশি স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতায় মহামিছিল

নেপালে ছাত্রসম্মেলনে আমন্ত্রিত এ আই ডি এস ও

গত ২০-২৪ ফেব্রুয়ারি অখিল নেপাল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র বিদ্যার্থী ইউনিয়ন (একীকৃত)-এর ষষ্ঠদশ সম্মেলনে আমন্ত্রিত এ আই ডি এস ও'র প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়। ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি কাঠমাণ্ডু শহরের কেন্দ্রস্থল বসন্তপুর রাজদরবার চকে সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন। দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য সমাবেশে সাতদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত নেপালি কংগ্রেস, নেপালি কংগ্রেস (প্রজাতান্ত্রিক), এন সি পি (ইউ এম এল) এবং মাওবাদী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন নেপালের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক ছয়টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। প্রকাশ্য সমাবেশে নেপালের বাইরের দেশের একমাত্র ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড দেবাশিস রায় বলেন, নেপাল আজ এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজতন্ত্রের অবসানের পর নেপালি জনতার সামনে আজ দু'টো পথ। একটি পুঁজিবাদী সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ, অপরটি 'জনগণের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্রের' (people's democracy) পথ। তাঁদের আজ ঠিক করতে হবে কোন্ পথে তাঁরা এগোবেন। ভারত সহ বিভিন্ন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র জনতাকে 'উপহার' দিয়েছে দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। মানুষের জীবনে এনেছে চরম অনিশ্চয়তা। যত দিন যাচ্ছে সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য চূড়ান্ত আকার নিচ্ছে। আর অন্যদিকে 'জনগণতন্ত্র' বা 'সমাজতন্ত্র' জনগণকে দিতে পারে মানুষের মত মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ও নিশ্চয়তা, দূর করতে পারে চূড়ান্ত আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য। ফলে নেপালি জনতাকেই আজ স্থির করতে হবে, কোন্ পথে তাঁরা চলবেন। ভারতের শোষিত জনগণ তথা সর্বহারাশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই ও আমাদের ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও সর্বদা নেপালি জনগণের ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনের পাশে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। নেপালের এই ঐতিহাসিক আন্দোলন বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিয়ত অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে, সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী লড়াই এবং গণআন্দোলনই ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে তিনি আবেদন করেন, আজকের এই বিশেষ সঙ্কটের মুহূর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও পরাস্ত নেপালি রাজতন্ত্রের সমস্ত প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপাল ও ভারতের শোষিত মানুষের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা প্রয়োজন।

এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল কাঠমাণ্ডু শহরের অন্য একটি ক্যাম্পাসে। কিন্তু ১৯ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ধিকৃত রাজা জ্ঞানেন্দ্রর একটি দাম্ভিক বিবৃতি — "জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে জরুরি অবস্থা জারি করে সঠিক কাজ করেছি, গত ১৫ মাসে যা ঘটে চলেছে তার জন্য সকলেই দায়ী" — জনগণের রোষের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। পুনরায় উত্তাল হয়ে ওঠে নেপাল। রাতারাতি প্রকাশ্য সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করে কাঠমাণ্ডু শহরের কেন্দ্রস্থল বসন্তপুর রাজদরবার চকে আয়োজন করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় দশ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী বিশাল সুশৃঙ্খল ও বর্ণাঢ্য মিছিল কাঠমাণ্ডু শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বসন্তপুর রাজদরবার চকে এসে সমবেত হয়। মিছিলের সম্মুখভাগে নেপালের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে কমরেড দেবাশিস রায়ও ছিলেন। রাজদরবার চকের বিরাট প্রাঙ্গণে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও জনতার এই সমাবেশে নেপালের বিশিষ্ট জননেতা, 'জনমোর্চা-নেপালে'র সভাপতি ও বর্তমান সাতদলীয় জোট সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী কমরেড অমৃক শেরচান্ ঘোষণা করেন, "রাজা জ্ঞানেন্দ্রর এই প্ররোচনামূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁর সরকার উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে রাজা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত নেপালবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ এন এন এফ এস ইউ (ইউ)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড জীবন গৌতম এবং সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কমরেড প্রকাশ পোখরেল। সমাবেশেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে সংগঠনের রক্তিম পতাকা ও উপহারসামগ্রী সভাপতিকে প্রদান করা হয়।

২১-২২ ফেব্রুয়ারি কাঠমাণ্ডু উপত্যকার কীর্তিপুরে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছাত্রনেতারা কমরেড দেবাশিস রায়কে প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান জানান। ইতিপূর্বে বিদেশের কোনও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনকে এই সুযোগ তাঁরা দেননি। নেপালের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে পাঁচশত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে কমরেড দেবাশিস রায় তাঁর ভাষণে আজকের এই তথাকথিত বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি সহ সমস্ত কিছুকেই পণ্যে পরিণত করেছে তা ব্যাখ্যা করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি নেপালের সাত পার্টি জোটের (এস পি এ) অন্যতম শরিক বিপ্লবী বামপন্থী দল সিপিএন (ইউনিটি সেন্টার-মশাল)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশের সাথে কমরেড দেবাশিস রায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উপপ্রধানমন্ত্রী এবং জনমোর্চা-নেপালের সভাপতি কমরেড অমৃক শেরচান-এর উপস্থিতিতে তাঁরই বাসভবনে। উল্লেখযোগ্য যে, কমরেড প্রকাশের নেতৃত্বে এই দলটিই নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে সাতপার্টি জোট ও মাওবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলেই নেপালে গত বছরে ১৯ দিনের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল যা গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করেছে। ঐ বৈঠকে কমরেড দেবাশিস রায়, কমরেড প্রকাশের কাছে নেপালের বিগত ও সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, জোট সরকার চালানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নানা প্রশ্ন রাখেন। কমরেড প্রকাশ দীর্ঘ সময় ধরে এসব প্রশ্নের উপর আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। পরিশেষে উভয়েই দুই দেশের বামপন্থী ও বিপ্লবী শক্তির মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

বক্তব্য রখছেন কমরেড দেবাশিস রায়

এছাড়াও ১৯ ফেব্রুয়ারি কাঠমাণ্ডুতে কমরেড দেবাশিস রায় নেপালের শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নেপালের বর্তমান আন্দোলন ও ভবিষ্যত নেপাল' শীর্ষক আলোচনাসভায় অংশ নেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি নেপালের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কমরেড শ্যাম শ্রেষ্ঠর সাথেও এ বিষয়ে কমরেড রায়ের দীর্ঘ আলোচনা হয়।

এই সম্মেলন উপলক্ষে সর্বহারার মহান নেতা এযুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের যে সমস্ত রচনা এবং এস ইউ সি আই প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা কমরেড দেবাশিস রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, অতি দ্রুত তা বিক্রি হয়ে যায়।

দুষ্কৃতীদের জড়ো করে আসানসোলে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা

মিথ্যাচার, ভাঁওতা, প্রতারণা — এসবই আজ যে সিপিএমের মূল অবলম্বন হয়ে উঠেছে, আসানসোলের গাঁরুই গ্রামের মানুষেরা তা আবারও উপলব্ধি করলেন। এই গ্রামের ৬৭ একর জমি ২০০৬ সালে সরকারের 'ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট' দপ্তর অধিগ্রহণ করেছিল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, যে টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়ার কথা ছিল তা দেওয়া হয়নি। তারা দাম পেয়েছেন সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬০০০ টাকা কাঠা দরে। গ্রামবাসীদের দাবি বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য দিতে হবে এবং জমিহারা পরিবার প্রতি একজনের চাকরি দিতে হবে।

এই দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে গ্রামবাসীরা সংগঠিত হচ্ছেন; গড়ে তুলেছেন 'জমি উচ্ছেদ বিরোধী প্রস্তুতি কমিটি'। এই কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রামের দুর্গামন্দির প্রাঙ্গনে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কনভেনশন ভেস্তে দিতে সিপিএম আরেক মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি তারা প্রচার করে যে, ঐ এলাকার বেআইনি কয়লাখনিগুলি গ্রামবাসীরা বন্ধ করতে চাইছে। এই প্রচার তুলে সিপিএম তার ক্রিমিনাল বাহিনী ও কোল মাফিয়াদের জড়ো করে কনভেনশন বানচাল করতে নামে। শুরু হয় আন্দোলনের কর্মী সমর্থকদের হুমকি দেওয়া। পুলিশও আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের সভা বন্ধ করার অনুরোধের নামে চাপ দিতে থাকে। এখানেই শেষ নয়, আগে থেকেই সভাস্থলে সিপিএম তাদের কিষাণ সভার ব্যানার ফেস্টুন টাঙিয়ে ২০০/২৫০ কোলমাফিয়া জড়ো করে এবং গ্রামে ঢোকার সমস্ত রাস্তায় ক্রিমিনাল মোতায়েন করে কনভেনশন বানচাল করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা গ্রামবাসীদের সিপিএমের উপর আরও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। পুনরায় এই সম্মেলনকে সফল করার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করেন তাঁরা। এই ঘটনা আরও দেখিয়ে দিচ্ছে, বেআইনি কারবারী, কোলমাফিয়া, ক্রিমিনালবাহিনী এবং নানা পাচারের সঙ্গে যারা জড়িত আজ তারাই সিপিএমের কাণ্ডারী।

স্বীকৃতির দাবিতে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের আহ্বানে প্রায় পাঁচ হাজার মোটরভ্যান চালক পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নিকট ডেপুটেশন দেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মহাকরণ অভিমুখী মিছিল রানি রাসমণি রোডে পুলিশের বাধা পায়। শ্রমিকরা সেখানেই বসে পড়েন এবং বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড শিশির মিস্ত্রি। প্রায় ২০ হাজার মোটরভ্যান চালকের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি সমাবেশে পাঠ করে শোনান সমিতির অন্যতম সহ-সম্পাদক জয়ন্ত সাহা। এরপর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালীর নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল পরিবহনমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দেন। কিন্তু পরিবহনমন্ত্রী উপস্থিত না থাকায় বিভাগীয় সচিব স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি পরিবহন মন্ত্রীর সাথে অবিলম্বে বৈঠকের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সমাবেশে প্রতিটি জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড সুজিত ভট্টশালী বলেন, যান্ত্রিক ভ্যান গ্রামীণ জীবনের বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের প্রয়োজনে জনগণই সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থা যখন খুবই দুর্বল ও ব্যয়বহুল তখন মোটরভ্যান গ্রামীণ জীবনে গতি এনেছে, বিপদে-আপদে বন্ধুর ভূমিকা নিয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে পণ্য সরবরাহে তার ব্যবহার অতুলনীয়।

তিনি দুঃখের সাথে বলেন যে, বেকারের সংখ্যা যখন প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, তখন নিজস্ব উদ্যোগে ধার-দেনা করে রাজ্যের ৭৫/৮০ হাজার মোটরভ্যান চালক এবং এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও ২০/২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে তখন সরকার এদের উচ্ছেদ করতে যে নিষ্ঠুর আচরণ করছে তা রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে ব্যথিত, স্তম্ভিত করে তুলেছে। হয়রানি, জুলুম, গ্রেপ্তার, মোটরভ্যান কেড়ে নেওয়া, বড় অঙ্কের তোলা দিতে বাধ্য করার মত গর্হিত কাজ পুলিশ নির্দ্বিধায় করে চলেছে। তিনি বলেন, মোটরভ্যানের পক্ষে যদি আইন না থাকে তবে এখন মানুষের প্রয়োজনে সরকারকে সেই আইন করতে হবে। আর এ কারণেই পরিবহনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক অত্যন্ত জরুরি।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক, বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য মোটরভ্যান চালকদের এই সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, শ্রমিকরা এখন যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, বীমা ইত্যাদির সুযোগ পান, শ্রমিক হিসাবে যে স্বীকৃতি, তার শ্রমের মর্যাদার যে স্বীকৃতি আজ পেয়েছেন — দীর্ঘ সংগ্রাম করেই সেগুলির আইন প্রণয়ন করাতে হয়েছে। অনুরূপভাবে রিক্সার পরবর্তীকালে যে অটোরিক্সা এলো তাকেও সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা আদায় করতে হয়েছে। মোটরভ্যানকেও এই স্বীকৃতি এবং তার চালকদের সুযোগ-সুবিধাগুলো আদায় করতে হবে এবং এজন্য দীর্ঘস্থায়ী, সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বক্তব্য রখছেন কমরেড সুজিত ভট্টশালী

চটকল ধর্মঘটের শিক্ষা

রাজ্যের আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকের ধর্মঘট আংশিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে ৮ মার্চ শেষ হয়েছে। কুড়িটি শ্রমিক সংগঠনের ঐক্যের অর্থে ঐতিহাসিক এই লড়াই যে সাফল্য পেতে পারত, বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের আপসকামী ও মালিকদরদী মনোভাবের জন্য সে সাফল্য আসেনি। নভেম্বর ২০০৫ থেকে শ্রমিকদের ২৫৭ পয়েন্ট মহার্ঘভাতা আইনত প্রাপ্য। এছাড়া ছিল গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও সর্বোপরি ন্যূনতম নির্দিষ্ট মজুরির দাবি।

অসীম কষ্ট স্বীকার করেও শ্রমিকরা আন্দোলনে অবিচল ছিল। ঘরে অভাব, রোগে ওষুধ নেই ; কমিউনিটি কিচেনে খিচুড়ি খেয়ে, এমনকী না খেয়েও মর্যাদার লড়াই লড়ছিল তারা। কিন্তু হাঁটু কেঁপে গেল নেতৃত্বের উপরতলার একাংশের। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ন্যূনতম মজুরির প্রশ্ন, ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রভৃতি মীমাংসাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে ২০০ পয়েন্ট মহার্ঘভাতা, যা আইনত নভেম্বর '০৫ থেকে প্রাপ্য, তা এখন থেকে মালিকরা দেবে। বাকি ৫৭ পয়েন্ট পাওনা ১ অক্টোবর ২০০৭ থেকে দেওয়া হবে; অন্যান্য প্রাপ্য নিয়ে ভবিষ্যতে মীমাংসা হবে। কেবল মর্যাদাহানিকর কোনও শর্ত নেই বলে ঐক্যের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী ইউ টি ইউ সি-এল এস এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

এবারের চটকল ধর্মঘটে শ্রমিকরা যেসব দাবি তুলেছিল, সেগুলি ন্যায়সঙ্গত তো বটেই, পুরোপুরি আইনসম্মতও ছিল। মালিকরা যদি আইন মেনে চলত, তাহলে এই ধর্মঘটের প্রয়োজনই ছিল না। আরও লক্ষণীয় যে, মালিকদের এমন ঔদ্ধত্যের সামনেও সিপিএম সরকার নীরব রইল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন বণিকসভাগুলিতে গিয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়ে বলেন, 'আন্দোলন করা চলবে না'। অথচ ৬২ দিন ধরে চটকল ধর্মঘট চললেও মুখ্যমন্ত্রী একটিবারের জন্যও মালিকদের 'আইন মেনে চলার' কথাটুকু বলার সময় পাননি। তাঁর 'শিল্পবান্ধব' ভাবমূর্তি তৈরির যত চেষ্টাই হোক, সচেতন শ্রমিক বোঝে যে, মুখ্যমন্ত্রী আসলে 'শিল্পপতিবান্ধব'। বস্তুত, সরকার যদি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এমনকী আইনি রক্ষাকবচটিও নিশ্চিত করার চেষ্টা করত, তাহলে মালিকরা এমন বেপরোয়াভাব দেখাতে পারত না।

চটকল শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা নতুন নয়। ২০০২ সালের চটকল ধর্মঘটে মালিকরা যখন আইনসঙ্গত ভাবে শ্রমিকদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দিতে বাধ্য হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ তার বিনিময়ে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৭৩ টাকা থেকে ১০০ টাকায় কমিয়ে দিয়েছিল, মজুরির এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনের সাথে যুক্ত করার শর্ত যোগ করে দিয়েছিল চুক্তিতে, যাকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী কালাচুক্তি আখ্যা দিয়ে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিল। অন্যান্যরা স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও মালিকরা কিন্তু শ্রমিকদের প্রাপ্য দেয়নি, সেটুকু আদায় করতেও আবার ২০০৪ সালে তাদের ধর্মঘটে যেতে হয়েছিল। এবারও দীর্ঘ ৬২ দিন ধর্মঘট করার পরও ন্যূনতম মজুরির ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত দাবি মেটানো হয়নি, যেজন্য বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস জুট মিলের ৪০০০ শ্রমিক ইউ টি ইউ সি-এল এসের নেতৃত্বে ১৩০ দিন পরেও ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্যই ১০ মার্চ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এক প্রেস বিবৃতিতে দাবি জানান, "ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে বারবার গ্যাঞ্জেস জুটমিলের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির মীমাংসার জন্য দাবি তোলা হয়েছে। কুড়িটি ইউনিয়নের এবং শ্রমমন্ত্রীর এ বিষয়ে সহমর্মিতা এবং আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বৈঠকে এই বিষয়ে কোনও সুরাহা না হওয়াতে শ্রমিকরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ, হতাশ এবং তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অটল। ফলে অবিলম্বে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সমস্ত ইউনিয়নের সহযোগিতায় গ্যাঞ্জেস জুটমিলের চার হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটের দ্রুত এবং যথাযথ মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।"

এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর উপস্থিতির জন্যই এবারের চুক্তিতে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী উৎপাদনভিত্তিক বেতনের শর্ত নেই এবং আগামী দিনে বৈধ দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের পথ খোলা রাখা সম্ভব হল।

এই লড়াই অন্যদিকে আরও দেখাল, শ্রমিকদের অদম্য তেজ, সাহসিকতা যেমন চাই, তেমনই চাই সঠিক নেতৃত্ব। সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না। এই আন্দোলনে অন্যান্য আপসকামী নেতৃত্বের পাশাপাশি ইউ টি ইউ সি-এল এস নেতৃত্বের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে শ্রমিকরা দেখল। এই আন্দোলনের একটা বড় সাফল্য হল শ্রমিকদের চাপে এবার অনিচ্ছুক নেতৃত্বকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছিল। এই আন্দোলনের সাফল্য ও সম্ভাবনা বিচার করে, আমরা মনে করি, আগামী দিনে শ্রমিকশ্রেণী আরও রাজনীতি সচেতন হবে ও সঠিক নেতৃত্বকে চিনে নিয়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনবে।

প্রতিবাদের ভাষা ও চেতনা সমাজে সঞ্চারিত করতে হবে

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অঙ্গীকার

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক কনভেনশনে এই মূল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

"শিক্ষক - শিক্ষাবিদ - কবি-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মী-শিল্পী-বিজ্ঞানী - আইনজীবী - চিকিৎসক-ক্রীড়াবিদদের দ্বারা আহূত এই মহতী কনভেনশন লক্ষ করছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুদিন যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পায়নের ধুয়ো তুলে কৃষকদের সুজলা, সুফলা জমি কেড়ে নিচ্ছে। কৃষিজমিতে কারখানা, আবাসন, রাস্তা, বন্দর, পর্যটনকেন্দ্র, রাসায়নিক কেন্দ্র ইত্যাদি বানানোর উদ্যোগ চলছে সর্বত্র। যে সব কৃষক ও সাধারণ মানুষ জমি দিতে রাজি হননি এবং এই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন তাদের উপর নামিয়ে আনা হচ্ছে বর্বর পুলিশ ও ক্যাডারবাহিনীর আক্রমণ। এমনই ঘটনা ঘটেছে সিঙ্গুরে, ঘটেছে নন্দীগ্রামে। এমনটা ঘটার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে মহিষাদল, কুলপি, মগরাহাট, খড়্গপুর, ফুলবাড়ি, ডোমজুড়, হরিপুর, বারুইপুর, ভাঙড়, বারাসাত প্রভৃতি অসংখ্য অঞ্চল। কিন্তু আশঙ্কা আর ভীতিকে সম্বল করে আর দিন কাটাতে রাজি নন এ রাজ্যের বহু মানুষ। তাই গড়ে উঠছে সংঘবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রতিরোধ। এ রাজ্যে সরকার শুধু যে ইচ্ছামতো দু-ফসলি, তিন-ফসলি কৃষিজমি নির্বিচারে অধিগ্রহণ করছে তাই নয়, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্যবাসীকে সঠিক তথ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, নির্লজ্জ মিথ্যাপ্রচারে মানুষকে দিশাহীন, বিভ্রান্ত করতে চাইছে এবং সর্বোপরি নিরীহ, দরিদ্র মানুষের জীবন ও সম্পত্তিহানি ঘটাচ্ছে। আর এ সবই নাকি হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে। অথচ এভাবে নির্বিচারে কৃষি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কোন্ উন্নয়ন, কার মঙ্গল সাধিত হবে সেই প্রশ্নের কোন পরিচ্ছন্ন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। আর প্রশ্নমাত্রকেই বিরোধিতা ধরে নিয়ে প্রশ্নকারীকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'উন্নয়ন বিরোধী', 'শিল্পায়ন বিরোধী' শত্রু হিসাবে।

এই কনভেনশন আরও লক্ষ করছে যে, জমি অধিগ্রহণের জন্য এই সরকার ব্রিটিশ আমলের ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪-এর সাহায্য নিচ্ছে, যাতে বলা আছে সরকার জমি নিতে পারে জনস্বার্থে। এই জনস্বার্থ কথাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা নেই। আবার শিল্পপতিদের সুবিধার্থে এই আইনের ১৯৯৪ সালের সংশোধনীতে কোন কোম্পানির জন্য জমি নেওয়াকেও 'জনস্বার্থ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আইন যেহেতু জমিকে কেবলমাত্র পণ্য হিসাবে দেখেছে, তাই ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কেবল বাজার দর (market value) ধরা হচ্ছে। কিন্তু ধরা হচ্ছে না জমিকে কেন্দ্র করে প্রজন্মের পর প্রজন্মের জীবিকানির্বাহ, জমিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি, জমিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন, ভূমিহীনতা, কর্মচ্যুতি, গৃহহীনতা, পরিবেশের ভারসাম্য, ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ, জীব ও উদ্ভিদবৈচিত্র্য, আগামী দিনের ফলনশীলতা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার সমস্যা ইত্যাদি। ফলে অতি সরলীকৃত হিসাবে চাষীর হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ফাঁপা চাকরির আশ্বাস দিয়ে তাকে ভূমিচ্যুত করা হচ্ছে। নিকৃষ্ট ধরনের এই বঞ্চনার সাম্প্রতিকতম জ্বলন্ত উদাহরণ হ'ল রাজারহাট টাউনশিপ যা গড়ার জন্য ভূমিচ্যুত ২৬ হাজার কৃষক ও তার সঙ্গে কয়েক হাজার বর্গাদার ও হাজার হাজার খেতমজুরের কেউই কোন কাজ পায়নি।

উল্লেখ্য, এখানে রাজ্য সরকার চাষীদের কাছ থেকে মাত্র ১৩ হাজার ৫০০ টাকা কাঠা দরে জমি কিনে তা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কাঠা ধরে বিক্রি করেছে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায়, হরিয়ানা সরকার ঐ রাজ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য যে সব চাষীর জমি অধিগ্রহণ করেছিল তাদের একর প্রতি ৩০ লক্ষ টাকা দাম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার চাষীরা তা প্রত্যাখ্যান করে তীব্র আন্দোলনের চাপে সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গে একর প্রতি ২ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দাম ধার্য করে এ রাজ্যের সরকার বড় গলায় ঘোষণা করছে যে, তারা নাকি রেকর্ড পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।

আজকের পুঁজিনিবিড় শিল্পে যেহেতু অদক্ষ চাষীদের নিয়োগের সম্ভাবনাই নেই, তাই হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে চাকরি জুটেছে মাত্র কয়েকশো মানুষের। এই কনভেশন আরও লক্ষ করছে যে, সরকারি হিসাব অনুযায়ী গত ৫ বছরে এ রাজ্যে ১ লক্ষ ২৩ হাজার একর কৃষিজমি লুপ্ত হয়েছে। ঐসব জমিতে গড়ে প্রতি একরে ১১ কুইন্টাল হিসেবে ১৩ লক্ষ কুইন্টাল চাল উৎপন্ন হত যা প্রায় ৭ লক্ষ মানুষের এক বছরের খাদ্যের যোগান দিত। আবার, একর পিছু উৎপাদনশীলতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতের মধ্যে পাঁচ নম্বরে। এই পরিস্থিতিতে আগামী পাঁচ বছরে সরকারের আরও এক লক্ষ একর কৃষিজমি ধ্বংসের পরিকল্পনার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, জীবনের অধিকার আরও বেশি সঙ্কুচিত হবে, আমলাশোল-জলঙ্গি-উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের মতো অনাহারে মৃত মানুষের তালিকা আরও লম্বা হবে।

এই কনভেনশনের সুচিন্তিত অভিমত হ'ল এই যে, সরকার ৫৬ হাজার বন্ধ কারখানার হাজার হাজার একর জমি শিল্প তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারত। এছাড়া সরকারি হিসাবকে সত্য বলে মেনে নিলে এ রাজ্যে ১ শতাংশ অকৃষি জমি (যা প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশি প্রায় ৪.৪৫ শতাংশ) অর্থাৎ ২ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি সরকার শিল্পস্থাপনে ব্যবহার করতে পারত। উল্লেখ্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মত শুখা জেলাগুলিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় জল যোগানোর জন্য দামোদর, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, অজয়ের মতো বড় নদ-নদী ছাড়াও ৩০টির মতো ছোট নদী আছে; আর আছে বিপুল খনিজ সম্পদ ও বিশাল অকৃষি ও পতিত জমি যা মানুষের কাজে লাগে না। সেখানে শিল্প স্থাপনের অসুবিধাই বা কী?

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এই কনভেনশন লক্ষ করছে যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) বা এস ই জেড গড়ার নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চরম জনবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। এই এস ই জেডগুলি হবে দেশের মধ্যে এক একটি বিদেশভূমি, যেখানে লগ্নিকারী পুঁজিপতিদের জন্য যে আইন তৈরি হবে তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সব মানুষের জন্য তৈরি আইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এইসব পুঁজিপতি যেসব সুবিধা পাবে তার মধ্যে আছে নিঃশুল্ক জলসরবরাহ, বিশেষ সুবিধাজনক হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ (প্রয়োজনে এরা নিজেরা বিদ্যুৎ উৎপাদনও করতে পারবে), উৎপাদিত পণ্যে সমস্তরকম শুল্ক ছাড়, আমদানিশুল্ক ছাড়, শিল্পকাঠামো বা আবাসন নির্মাণে সরকারি সহযোগিতা ইত্যাদি। এছাড়াও এখানে শ্রমআইন প্রযোজ্য হবে না তাই শ্রমিকদের বেতনকাঠামো, কাজের সময়, চাকরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ মালিকের ইচ্ছাধীন থাকবে — এসব বিষয়ে শ্রমিকের অধিকার বলে কিছুই স্বীকৃত হবে না। এমনই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ চলছে দেশজুড়ে — কেবলমাত্র পুঁজির স্বার্থে। এই স্বার্থের কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করার ফলেই সাধারণ মানুষের চোখের জল আজ এই সব শাসক দলের নেতাদের মনে কোন আঁচড় কাটে না। তাই প্রায় দু-মাস ধরে চলা চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট মেটানোর তাগিদ কোন নেতা-মন্ত্রীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না; একের পর এক বন্ধ হওয়া উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু তথাকথিত এই 'বামপন্থী' নেতাদের মনে কোন রেখাপাত করে না। ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে অথবা পোকায় আক্রান্ত ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে চাষীরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের অসহায় পরিবারের আর্তিও এই মন্ত্রীদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

বর্তমান সময়ের এই সামাজিক পরিস্থিতি আজকের কনভেনশনকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করছে। কবিতায়-গানে-নাটকে-সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে-শিক্ষায়-বিজ্ঞানে আমরা মানুষের কথা বলতে চেষ্টা করি। জীবনের জয়গানই তো সুস্থ সংস্কৃতির ধর্ম।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংগ্রামী চরিত্রে অনন্য মহামিছিল

কিশোর কমিউনিস্ট উইং 'কমসোমলে'র সদস্যরা দৃপ্ত পদক্ষেপে সামিল মহামিছিলে

একের পাতার পর

প্রকাশ করে বলেছেন, "পার্টির নেতারা যে এভাবে মালিকদের দালাল হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। আপনারা এগিয়ে চলুন, আমরা আপনাদের সাথে আছি।" সিপিএম গত তিরিশ বছরে মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে মেরে দিয়েছিল ; ভেবেছিল মানুষ আর কোনদিন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। জমিরক্ষার আন্দোলনে মানুষের এই আগ্রহ, এই মহামিছিল তার মোক্ষম জবাব দিয়ে গেল।

এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় রাজ্যজুড়ে শত শত পথসভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বত্র মানুষ ভিড় করে পার্টির বক্তব্য শুনেছেন। সেগুলিতে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সরকার এবং সরকারি দলগুলির জনবিরোধী এবং দেশি-বিদেশি মালিকতোষণ নীতির স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে, সরকারি নীতি ও শাসকদলের দমন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ লিফলেট, পোস্টার, দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে দলের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মহামিছিলের পূর্ব ঘোষিত তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন আগে থেকেই প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে গোটা রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে মিছিলের কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়। পরবর্তী দিন ঘোষিত হয় ৯ মার্চ। চলতে থাকে প্রচার, মিটিং, মিছিল।

৯ মার্চ ভোর থেকেই রাজ্যের নানা জেলা থেকে ট্রেনে করে দলের কর্মী-দরদী, ভুমিরক্ষা আন্দোলনের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, সমর্থক হাজার হাজার মানুষ শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে থাকেন। এঁদের অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন আগের দিন সকালে, কেউ কেউ তারও আগের দিন। কোথাও দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে, ভ্যানে চড়ে, কোথাও নৌকা করে এসে স্টেশনে পৌঁছেছেন। ঘুম নেই, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, দীর্ঘ পথের ক্লান্তি — সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে মিছিলে যোগ দিতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন তাঁরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা গোসাবা, বাসন্তী থেকে মানুষ এসেছেন নৌকা করে। তাঁদেরই একজন, কমরেড বিকাশ শাসমল জানালেন, ভাটার সময়ে মাঝনদীতে নৌকা আটকে যাওয়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাত্রির অন্ধকারে নদীর চর ধরে কাদার মধ্য দিয়ে বহু মাইল হেঁটে, অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে তাঁরা পৌঁছেছেন ক্যানিং স্টেশনে; অন্ধকারে পথ হারিয়ে গেছে, কাঁটাগাছে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পা, তবু মিছিলে না এসে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেননি তাঁরা। অন্যান্য সব জেলা থেকেও মানুষ এসেছেন এমনই পরিশ্রম ও কষ্ট করে। বেলা যত বেড়েছে, ততই বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষের মিছিল শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে পৌঁছেছে জমায়েত স্থল উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে। ধীরে ধীরে ভরে উঠেছে পার্ক, অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে পার্ক সংলগ্ন বিধান সরণী, বিডন স্ট্রিট।

মিছিল শুরুর আগে থেকেই মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল, মিছিলে কারা কোথায় থাকবে, কোন্ জেলার পর থাকবে কোন্ জেলা। ভলান্টিয়াররা দ্রুত সাজিয়ে তুলছিলেন মিছিলটিকে। লাল পতাকায়, ব্যানারে, রঙিন ফেস্টুন, দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রভৃতিতে সেজে উঠেছিল মিছিল। মধ্যে মধ্যে ছিল ট্যাবলো, তার গায়ে কোথাও আঁকা মৃত মানুষের খুলির স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে করমর্দন করছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং টাটা কোম্পানির কর্ণধার রতন টাটা। কোনটিতে আঁকা ছিল মানুষের প্রাণের বিনিময়ে তৈরির প্রতীক হিসাবে কঙ্কালের হাতে তুলে ধরা টাটা কোম্পানির নামাঙ্কিত গাড়ি। কোনও ট্যাবলোতে ছিল — পুলিশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও এস ইউ সি আই কর্মীরা কেমন বীরত্বের সঙ্গে জমিরক্ষার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন — তার জীবন্ত ফটোগ্রাফ। কোনও গাড়ি থেকে মিউজিক স্কোয়াডের সদস্যদের গলায় ভেসে আসছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে রচিত সঙ্গীতের সুর।

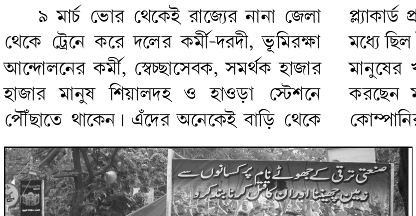

মহামিছিলের একটি ট্যাবলো

মিছিলের সামনে ছিল মহামিছিলের দাবি সম্বলিত এক দীর্ঘ ব্যানার, যা বহন করে নিয়ে চলেছিল কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের সদস্যরা। তার পিছনে ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। মিছিল সাজানো হয়েছিল প্রথমে আট লাইনে, পরে ছয় লাইনে, তার পরে সমগ্র মিছিলই ছিল চার লাইনে। পুলিশের এক আই বি অফিসার ওয়াকিটকিতে তাঁর ওপরওয়ালাকে জানাচ্ছেন— "হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে স্যার, ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে না, আরও মিছিল আসছে। ..."

রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকেই এসেছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। রাজ্যের যে সমস্ত এলাকার কয়েক লক্ষ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের কথা সরকার ঘোষণা করেছে, অসংখ্য মানুষ এসেছেন সেই সমস্ত এলাকা থেকে। আবার যে এলাকায় জমি নেওয়ার কোনও প্রস্তাব নেই, সেখান থেকেও এসেছেন বহু মানুষ। এসেছেন শিল্পাঞ্চল, বন্ধ কারখানা এবং চা-বাগানের শ্রমিকরা। মিছিলে ছিলেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক, মহিলা, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী এমনকী সমাজের অবহেলিত পরিচারিকারাও। নদীয়ার ধুবুলিয়া থেকে এসেছিলেন ৫০ জন কৃষক। "আপনাদের জমি তো সরকার নিচ্ছে না, তবে কেন এসেছেন এই মিছিলে?" — প্রশ্ন করতেই উত্তর দিলেন পাত্রদহ গ্রামের মহম্মদ শেখ, দীনবন্ধু ঘোষ, আইনাল শেখ, মেহের মণ্ডলরা। বললেন— "আমরাও তো চাষী, সরকার যে চাষীদের জমি কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারি করে দিচ্ছে, চাষী হয়ে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে কি পারি ?" বললেন, "আমাদেরও অনেক সমস্যা রয়েছে ; কৃষিবিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে, বীজের দাম, কীটনাশকের দাম বাড়ছে, ফসলের দামের কোনও গ্যারান্টি নেই। এ'সব নিয়ে আমরাও আন্দোলন করছি।" বর্ধমানের কাটোয়া থেকে এসেছেন লাল্টু মণ্ডল, রাইচরণ সাহা-রা। বললেন, "আমরা ৫০০ জন এসেছি"। এঁদের বেশিরভাগেরই জমি নেওয়ার কথা সরকার ঘোষণা করেছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নামে। বললেন, "নন্দীগ্রাম আমাদের পথ দেখিয়েছে। আজ আমরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে আছি।" দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "জেনে রাখুন, কাটোয়ায় আরও বড় লড়াই হবে।" এ এক নতুন চেতনা — ঐক্যবদ্ধভাবে না দাঁড়ালে কেউ বাঁচবে না। জমিরক্ষার আন্দোলন রাজ্যের কৃষকদের আজ এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁরা জানালেন, বহুফসলি জমি বাঁচাতে কাটোয়ার কৃষকরা 'কৃষক-খেতমজুর বাঁচাও কমিটি' গড়ে তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন; গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠছে শাখা কমিটি। রাইচরণবাবু জানালেন, তিনি ৬ মাস আগেও এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বললাম, "অন্যান্য দলও তো জমিরক্ষার আন্দোলনে আছে। আপনারা এস ইউ সি আই-এর মিছিলে এলেন কেন?" বললেন, "আন্দোলনে এসে বুঝেছি, এস ইউ সি আই-ই একমাত্র দল যে মুখে যা বলে, কাজে তাই করে।" বললেন, "আমার মতো অনেকেই এই প্রথম মিছিলে এসেছে"। খরাপীড়িত দরিদ্র এলাকা বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ থেকে এসেছিলেন গণেশ হাঁসদা, বাবুলাল মণ্ডলরা। বললেন, "একফসলি জমি আমাদের, তাও আকাশের উপর নির্ভর। সেচের কোনও ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট নেই, মানুষ কীভাবে জীবন চালায় কেউ তার খোঁজ রাখে না। এর বিরুদ্ধেই আমাদের মিছিলে আসা।" বললেন, "নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ যে প্রতিরোধ করছে তা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন জিনিস"।

বারুইপুরের ধোপাগাছি, চাকারবেড়ে, জগদীশপুর, বামুনগাছি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছিলেন গুরুপদ মণ্ডল, স্বপন বিশ্বাস, উৎপল মণ্ডলরা। সরকার এবং সালিম গোষ্ঠীর জমি দখলের বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুর সংগ্রাম কমিটি

সাতের পাতায় দেখুন

স্ট্যালিনবিরোধী প্রচারের উৎস সন্ধানে

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বয়স যখন মাত্র সাত, সেইসময় তার প্রতিষ্ঠাতা মহান লেনিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর হাতে গড়া সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে কমরেড জে ভি স্ট্যালিনের উপর। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা চতুর্দিক বেষ্টিত দুনিয়ার প্রথম শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার প্রতি তখন গোটা বিশ্বের কোটি কোটি শোষিত জনগণ এবং মহৎ প্রাণের মানবতাবাদীরা অসীম আগ্রহ ও আকাঙক্ষা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন এবং যাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য দেশের ভিতরে ও বাইরে চক্রান্তকারীরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেই সময়ে তাকে রক্ষার সুকঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে মহান লেনিনের মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে স্ট্যালিন শপথ নিয়ে বলেছিলেন, মহান নেতা ও শিক্ষকের পথ অনুসরণ করে সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রকে, শ্রমজীবী জনগণকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষার চেষ্টা করবেন। আমৃত্যু, যোগ্যতার সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে, পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি, জটিলতম রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভয়াবহ যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে পশ্চাদপদ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে ও শান্তির দুর্গে পরিণত করে স্ট্যালিন নিজের শপথ রক্ষা করেছেন এবং এই পথে বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণী ও মুক্তিকামী মানুষের মহান নেতায় পরিণত হয়েছেন। তিনি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক রূপে গণ্য হয়েছিলেন বিশ্বের সকল শোষিত জনগণের কাছে। ঠিক এ'কারণেই বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের চোখে তিনি ছিলেন ঘোরতর বিপজ্জনক পয়লা নম্বর শত্রু। সাবেক সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সমস্ত কৃতিত্ব আড়াল করতে এবং মহান কমিউনিস্ট আদর্শকে কালিমালিপ্ত করতে দুনিয়ায় সব থেকে বেশি আক্রমণ শাণিত হয়েছে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে। সম্পূর্ণ মানবিক মূল্যবোধহীন এক নিষ্ঠুর দানব হিসাবে তাঁর ছবি মিথ্যা গল্প বানিয়ে বানিয়ে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁকে মসীলিপ্ত করার যাবতীয় ষড়যন্ত্র সাম্রাজ্যবাদীরা করলেও তারা তা পারেনি। মৃত্যুর পর যখন সোভিয়েত পার্টির ভিতর থেকেই লেনিনবাদের শত্রুরা মাথা তুলল, পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কব্জা করল, মার্কস-লেনিনের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে স্ট্যালিনের চরিত্র হননে নামল, এবং সোভিয়েট পার্টির অসচেতন কর্মীরা তা ধরতে ব্যর্থ হল, তখনই সুবর্ণ সুযোগ পেল এতদিন দেশে ও পার্টির মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা প্রতিবিপ্লবীরা এবং বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। তারা দুনিয়াকে বোঝাল, স্ট্যালিনের নিজের পার্টির পক্ষ থেকেই যখন স্ট্যালিনের 'কুকর্ম' তুলে ধরা হচ্ছে, তাঁকে 'স্বৈরাচারী', 'গণহত্যাকারী' বলা হচ্ছে, তখন তা ষোল আনা সত্য না হয়ে পারে না। দুনিয়ার বহু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, যাঁরা এতদিন স্ট্যালিন নেতৃত্বকে অন্ধভাবে সমর্থন করছিল, তারাও এখন অন্ধভাবেই স্ট্যালিন বিরোধিতা শুরু করল। ফল কী হল ? স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার সময় যদি কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেও থাকে, তা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গভীর পর্যালোচনার কোন সুযোগই হল না, নিছক প্রয়াত স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসার ঝড় বইয়ে দেওয়া হল। মানবসভ্যতার এক মহান সন্তানকে 'গণহত্যাকারী' রূপে চিহ্নিত করা হল।

এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের দেখালেন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অবিসংবাদী অথরিটি হিসাবেই স্ট্যালিনের উত্থান ঘটেছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা জানার জন্য বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণ স্ট্যালিনের দিকেই তাকিয়ে থেকেছে। লেনিনবাদ কী, তার সঠিক ব্যাখ্যা বুখারিন-ট্রটস্কিরা দিতে পারেননি, দিয়েছেন স্ট্যালিন, যাকে হাতিয়ার করেই পূর্ব ইউরোপ থেকে শুরু করে চীন, ভিয়েতনামের জনগণ লড়াই করেছে ও জয়ী হয়েছে। স্ট্যালিনকে খাটো করা হলে তার দ্বারা আসলে লেনিনবাদকেই অস্বীকার করা হবে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে খাটো করা হলে একদিকে সাম্যবাদী আন্দোলনে 'অথরিটি'র ধারণাকেই ধুলিসাৎ করা হবে, অন্যদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে সুবিধাবাদ-সংস্কারবাদ-সংশোধনবাদসহ যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানির দরজা খুলে দেওয়া হবে। পরবর্তী ঘটনাবলী কমরেড শিবদাস ঘোষের হুঁশিয়ারিকে সত্য প্রমাণ করেছে। ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের আমলে সাম্যবাদী আন্দোলনে সংশোধনবাদ বানের জলের মতো ঢুকেছে এবং শেষপর্যন্ত প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু আমরা জানি, সমাজতন্ত্রই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। আজ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ দেশে দেশে সকল অংশের শ্রমজীবী জনগণের উপর ভয়াবহ শোষণ-উৎপীড়ন চালাচ্ছে, গোটা বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত দারিদ্র্য ও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদী নোংরা সংস্কৃতি, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বার্থপরতা, সমাজবিমুখতা মানবসমাজের নৈতিকতার ভিত্তিকেই ধসিয়ে দিচ্ছে। এর হাত থেকে মুক্তি একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারে। সমাজতন্ত্র জনগণের জন্য কেউ এনে দেবে না, শ্রমজীবী জনগণকে সংগঠিত হয়ে সঠিক আদর্শ ও নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই লক্ষ্য থেকে শোধনবাদ-সংস্কারবাদের সর্বনাশা প্রভাব থেকে মুক্ত করে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করতে পারলে, সেই মহৎ কর্মযজ্ঞ সফল হবে না। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের আহ্বান বুকে বহন করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ও সংশোধনবাদীদের প্রচারের জাল ছিন্ন করে সত্যানুসন্ধানে লিপ্ত রয়েছেন। সুইডিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী কমরেড মারিয়া সৌসা এই লক্ষ্য থেকেই সোভিয়েত আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন।

৫ মার্চ মহান স্ট্যালিনের স্মরণদিবস উপলক্ষে সেই রচনা ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা কয়েকটি পর্বে গণদাবীতে প্রকাশ করছি। এটি প্রথম পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

হিটলার থেকে হার্স্ট, কনকোয়েস্ট থেকে সলঝিনিৎসিন

স্ট্যালিন আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে গুলাগ লেবার ক্যাম্পগুলিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও খুন সম্পর্কে যেসব ভয়াবহ গল্প চালু আছে তার একটাও কখনো শোনেননি, এ'রকম মানুষ আজকের দুনিয়ায় বিরল। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই সব বন্দীশিবিরে নাকি লক্ষ লক্ষ বন্দীকে অনাহারে উপবাসে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং এরকমই আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে নাকি সেদিন সেখানে হত্যা করা হয়েছিল, শুধু এই কারণে যে তাঁরা ক্ষমতাসীনদের বিরোধী। স্ট্যালিন আমলের সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এইসব কাহিনী বহুল প্রচারিত। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এইসব গল্প বারে বারে নানা বইয়ে, খবরের কাগজে, রেডিওতে, টেলিভিশনে, চলচ্চিত্রে ফিরে ফিরে এসেছে এবং তাদের সরবরাহ করা তথ্যে গত ৫০ বছরে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার তথাকথিত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার শিকার এইসব মানুষের সংখ্যা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই বেড়ে চলেছে।

কিন্তু এইসব কাহিনী কি সত্য? কোথা থেকে এইসব কাহিনী এল? কারাই বা তা সরবরাহ করল? এই কাহিনীগুলোর লেখকরা বার বার দাবি করে এসেছেন যে, স্ট্যালিন আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর যে কথাগুলি তাঁরা বলে আসছেন তা নাকি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যেদিনই সেদেশের সরকারি মহাফেজখানা খুলে গোপন নথি সকলের সামনে প্রকাশিত হবে সেদিনই নাকি সবাই বুঝতে পারবে, এই কাহিনীগুলো খাঁটি সত্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই। ১৯৯১ সালেই তার পতন ঘটেছে। ইতিহাস গবেষকদের কাছে তার সমস্ত গোপন নথিপত্রই আজ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কিন্তু ঐ সমস্ত গল্পগুলোর সপক্ষে কোন তথ্যপ্রমাণ সেখানে পাওয়া গেল কি?

আজ সোভিয়েত আমলের সমস্ত গোপন নথিপত্রই ঘেঁটে দেখে খুব সহজেই বের করা সম্ভব, ঠিক কতজন সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে বন্দী ছিলেন, কে কত বছর সেখানে বন্দীশালায় কাটিয়েছেন, কতজন বন্দী অবস্থায় মারা গেছেন, বা ঠিক কতজনকে সেদিন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃত সংখ্যাটি জানার ক্ষেত্রে আজ আর কোনও বাধাই নেই। কিন্তু কী পাওয়া গেল সেখানে? দেখা গেল, এতদিনের বহুল প্রচারিত গল্পের সাথে প্রকৃত সত্যের মিল নেই। কারা এই গল্পগুলো রটিয়েছিল তা খুঁজলে দেখা যাবে, হিটলার থেকে হার্স্ট, কনকোয়েস্ট থেকে সলঝিনিৎসিন, সকলেই এর সঙ্গে যুক্ত।

স্ট্যালিনবিরোধী মিথ্যাপ্রচার শুরু হয় হিটলারের হাত দিয়েই

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে সারা পৃথিবীর উপরই এর প্রভাব পড়ে। ঐ বছর ৩০ জানুয়ারি হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন এবং নতুন সরকার গঠন করেন। প্রচণ্ড হিংসা ও প্রচলিত বিভিন্ন আইনকানুনের প্রায় কোনওরকম তোয়াক্কা না রেখেই এই সরকার শুরু করে তার কাজ। দেশের সমস্ত ক্ষমতা পুরোপুরি নিজেদের কুক্ষিগত করতে ৫ মার্চ তারা নতুন করে নির্বাচনের ডাক দেয়। তার আগেই অবশ্য তারা সমস্ত প্রচারযন্ত্রকে নিজেদের কব্জায় এনে ফেলেছিল। এইভাবে নিছক প্রচারের জোরে তারা নির্বাচনে নিজেদের জয়কে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগে, ২৭ ফেব্রুয়ারি, নাৎসিরা নিজেরাই জার্মানির পার্লামেন্ট 'রাইখস্টাগ' বিল্ডিং-এ আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রমাণ সাজিয়ে এই অগ্নিকাণ্ডের সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেয় কমিউনিস্টদের উপর। এই অবস্থায় যে নির্বাচন হয়, তাতে সারা জার্মানিতে প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ভোট পায় নাৎসিরা, যা ঐ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের প্রায় ৪৮ শতাংশ। রাইখস্টাগে তাদের ২৮৮ জন ডেপুটি নির্বাচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নাৎসিদের আক্রমণ এরপর পরিচালিত হয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দিকে। প্রথম দিকে যেসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি গড়ে ওঠে, নারীপুরুষ নির্বিশেষে বামপন্থী কর্মীসমর্থকদের ধরে ধরে এসব বন্দিশিবির ভর্তি করা হয়। এদিকে ঐ একই সময়ে অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদের সহায়তায় রাইখস্টাগে হিটলারের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ২৪ মার্চ, সেখানে একটা আইন পাশ করানো হয়, যার বলে পরবর্তী চার বছরের জন্য হিটলারের হাতে দেশের সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। এই ক্ষমতার বলে তিনি তখন থেকে পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়াই যেকোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হাতে পান। এই সময় থেকেই শুরু হয় খোলাখুলি ইহুদি নিধন। তাদেরকেও দলে দলে ধরে চালান করা হয় ঐ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির উপর বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে যেসব সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে, সেগুলিকেই অজুহাত করেন হিটলার। সওয়াল করা শুরু হয় — তাঁর সর্বময় ক্ষমতার সময়সীমা আরও বাড়ানো হোক। প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে শুরু হয় নতুন করে জার্মানির সামরিকীকরণের কাজ। নতুন করে জার্মান সেনাবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। জার্মানির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্ট্যালিনের রাশিয়া। ব্রিটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স তখন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হিটলারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। গোটা সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার লুঠের পথে কাঁটা সোভিয়েত ইউনিয়ন। এইরকম আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিটলারের প্রচারদপ্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এই সমস্ত ভয়াবহ গল্পকাহিনী তৈরি করে যা বিশ্বব্যাপী প্রচার করার দায়িত্ব নিয়েছিল, মার্কিন দেশের সেইসব সংবাদপত্র, যারা মশলাদার চাঞ্চল্যকর খবর ছেপে ব্যবসা করে।

হিটলারের দাবি
ইউক্রেন — জার্মান প্রভাবাধীন অঞ্চল

এইসময়ই হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, নাৎসিরা যেমনটি চায় সেই মনোভাব জার্মান জনসাধারণের মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে। উগ্র জাতিবাদের ভিত্তিতে এক বৃহত্তর জার্মানি গড়ে তোলার নেশা ধরানো হয়েছিল সেদিন জার্মান জনগণকে। বোঝানো হয়েছিল, খাঁটি আর্য রক্তের জার্মান জাতিই হবে সে দেশের একমাত্র অধীশ্বর। এই লক্ষ্যেই স্লোগান তোলা শুরু হয়, 'লেবেনস্রাউম', অর্থাৎ বাঁচবার জন্য যথেষ্ট জায়গা চাই। আসলে এটা ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ দখলের আগ্রাসী লক্ষ্যের উপর উগ্র জাতিবাদী মুখোস। এই তথাকথিত লেবেলস্রাউমের লক্ষ্যে যে সমস্ত অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়, তারই এক অংশ ছিল জার্মানির পূর্বদিকে অবস্থিত এক বিশাল অঞ্চল, যার আয়তন ছিল খোদ জার্মানির চেয়েও অনেক বড়। কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চলটিই ছিল তখনও পর্যন্ত জার্মানির অধিকারের বাইরে। অতএব অবিলম্বে তা দখল করা চাই। এর অনেক আগেই, ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'মাইন কাম্ফ' (আমার সংগ্রাম) গ্রন্থেই, হিটলার জার্মান লেবেলস্রাউমের জন্য ইউক্রেনকে এক অতি প্রয়োজনীয় অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর কথায়, ইউক্রেন এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলগুলি একমাত্র জার্মানির অধিকারে থাকলেই ওইসব অঞ্চলগুলির সম্পদের ঠিকঠাক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার হওয়া সম্ভব, নচেৎ নয়। ফলে নাৎসি প্রচারের মূল কথাই দাঁড়াল — জার্মান জাতির স্বার্থেই দরকার হলে তরবারির জোরেই এইসব অঞ্চলগুলিকে 'মুক্ত' করতে হবে। জার্মান জাতিকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্ট্যালিনবিরোধী প্রচারের উৎস সন্ধানে

পাঁচের পাতার পর

বাঁচাবার মতো প্রয়োজনীয় জায়গা করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই কাজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। অধিকার করার পর জার্মান উদ্যোগে, জার্মান প্রযুক্তির সাহায্যে সমগ্র ইউক্রেনকেই জার্মানির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগানদার এক শস্যাগারে পরিণত করা হবে। তার জন্য প্রথমে সেখানে বসবাসকারী 'ইতর' জাতির মানুষদের হাত থেকে ইউক্রেনকে মুক্ত করতে হবে। এইসব জাতির মানুষদের অবশ্য জার্মান অর্থনীতির স্বার্থে খেতেখামারে, কারখানায় বা জার্মান বাড়িতে পরিচারক হিসাবে দাসেদের মতো ব্যবহার করা চলতেই পারে।

কিন্তু ইউক্রেন দখল করতে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর এই যুদ্ধের জন্য আগে থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন যুদ্ধের উপযুক্ত উত্তেজনা তৈরি করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই গোয়েবলসের নেতৃত্বে নাৎসি প্রচারযন্ত্র শুরু করল মিথ্যা প্রচার যে, 'বলশেভিকদের নেতৃত্বে ইউক্রেনে ব্যাপক গণহত্যা সংগঠিত হচ্ছে, স্ট্যালিনের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে পরিকল্পিতভাবেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে, খেতে না পেয়ে সেখানে দলে দলে মানুষ অসহায়ভাবে মরছে। এইভাবেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে যাতে ইউক্রেনের কৃষকরা বাধ্য হয় তাদের হুকুম অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে নিতে।' এইসব মিথ্যা প্রচারের আসলে লক্ষ্য ছিল, ইউক্রেনে আসন্ন জার্মান সামরিক অভিযানের সপক্ষে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করা। কিন্তু এই লক্ষ্যে নাৎসিদের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো সত্ত্বেও সারা বিশ্বজুড়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে তা ব্যর্থ হয়। ফলে হিটলার ও গোয়েবলস্ বুঝতে পারেন, তাঁদের প্রচারকে সারা পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় পৌঁছে দিতে হলে তাঁদের অন্যান্য দেশেও কিছু বন্ধুর দরকার, যারা তাঁদের এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। এই সাহায্য এল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে।

ধনকুবের র‍্যানডল্ফ হার্স্ট এবং হিটলার — হরিহর আত্মা

উইলিয়াম র‍্যানডল্ফ হার্স্ট ছিলেন একজন মার্কিন ক্রোড়পতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জনমানস বিষিয়ে দেওয়ার কাজে নাৎসিদের প্রতি তিনি সাহায্যের দরাজ হাত বাড়িয়ে দেন। এই উইলিয়াম হার্স্টের আরও কতগুলি পরিচয় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি বিরাট বিরাট সংবাদপত্রের তিনি ছিলেন মালিক। আজকের 'ইয়েলো প্রেস' বা মশলাদার প্রচারমাধ্যম বলতে আমরা যা বুঝি, তারও জনক বলে হার্স্টকেই অভিহিত করা যায়। এইসব বাজারি পত্রিকার কাজই হচ্ছে নানা প্রকারের গরম গরম উত্তেজক খবর পরিবেশন করা।

উইলিয়াম হার্স্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ১৮৮৫ সালে। তাঁর বাবা জর্জ হার্স্টও ছিলেন একজন ক্রোড়পতি ও সফল ব্যবসায়ী। তিনি নানা খনি এবং সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন। মার্কিন সেনেটের একজন প্রতিনিধি হিসাবেও তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনিই তাঁর ছেলে উইলিয়ামের হাতে 'সান ফ্রান্সিসকো ডেইলি এক্সামিনার' পত্রিকার দায়িত্ব তুলে দেন। এটিকেই সংবাদপত্র দুনিয়ায় হার্স্ট সাম্রাজ্যের সূচনা বলা যেতে পারে। উত্তর আমেরিকার বহু মানুষেরই জীবন ও চিন্তাচেতনার উপর এই হার্স্ট সাম্রাজ্যের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর, উইলিয়াম হার্স্ট তাঁর খনিশিল্পের সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে দেন। এই সময় থেকে সংবাদপত্র দুনিয়াই হয়ে ওঠে তাঁর পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ব্যবসা। প্রথমেই তিনি 'নিউইয়র্ক মর্নিং জার্নাল' নামে একটি পত্রিকা কিনে নেন। এটি ছিল একটি যথেষ্ট ঐতিহ্যসম্পন্ন পত্রিকা। কিন্তু তাঁর হাতে যাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে যায়। খুব দ্রুত এটি উত্তেজক খবর পরিবেশনকারী পত্রিকা হয়ে দাঁড়ায়। মশলাদার চাঞ্চল্যকর গল্প কেনার জন্য তিনি কখনো পয়সার কার্পণ্য করতেন না। এমনকী যদি সেই মুহূর্তে কোনও ভয়াবহ অপরাধ বা খুনের মতো উত্তেজক ঘটনা নাও ঘটে থাকে, এই পত্রিকার সাংবাদিকদের এই ধরনের 'সাজানো' ঘটনারই রিপোর্ট পরিবেশন করতে উৎসাহ দেওয়া হত। 'হলুদ সাংবাদিকতার' বৈশিষ্ট্যই ওটা। মিথ্যা এবং সাজানো নানা উত্তেজক খবরকে সত্যি বলে পরিবেশন করাই এ ধরনের পত্রিকার কাজ।

এইসব মিথ্যা সাজানো, কিন্তু উত্তেজক খবর পরিবেশন করে হার্স্ট কিছুদিনের মধ্যেই বহু কোটি টাকার মালিক হয়ে উঠলেন। সংবাদপত্র দুনিয়ায় ততদিনে তিনি হয়ে উঠেছেন এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ১৯৩৫ সালে দেখা গেল, পৃথিবীর ধনীতম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ তখন ২০ কোটি ডলারেরও বেশি। ১৯৪০-এর দশকে দেখা গেল, তিনি মোট ২৫টি সংবাদপত্রের মালিক। শুধু তাই নয়, আরও ২৪টি সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকা, ১২টি রেডিও স্টেশন ও ২টি বিশ্বসংবাদদাতা সংস্থারও মালিকানা তখন তাঁরই হাতে। এছাড়াও যে 'কসমোপলিটান ফিল্ম কোম্পানি' বিভিন্ন সিনেমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করত, সেটিও ছিল তাঁরই। আরও বহু সংস্থারই তিনি ছিলেন মালিক। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম টিভি স্টেশনটিও তিনি কিনে নেন। বাল্টিমোরে স্থাপিত এই স্টেশনটির নাম ছিল বি ডবলিউ এ এল টিভি। এইসময় দেখা যায়, হার্স্ট গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংবাদপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়, আর তার পাঠকের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসে বহু মানুষই যেসব সংবাদ প্রতিদিন পড়েন, তারও অনেকগুলিই ওই হার্স্ট গোষ্ঠীর বিশ্ব সংবাদদাতা সংস্থা থেকেই সংগৃহীত হত। সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন সংবাদপত্র গোষ্ঠী ও সিনেমা কোম্পানিগুলিও এইসব সংবাদদাতা গোষ্ঠীগুলি থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করত ও নিজেদের ভাষায়, নিজস্ব আঙ্গিকে তা পরিবেশন করত। এইসব তথ্য থেকেই বোঝা যায়, মার্কিন রাজনীতিতে হার্স্ট সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল কী বিপুল। পরোক্ষভাবে বিশ্ব রাজনীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করার ক্ষমতা ছিল এই হার্স্ট সাম্রাজ্যের। বহু বছর ধরেই এই ক্ষমতার তারা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এসেছে। বিভিন্ন ইস্যুতেই, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেপক্ষে লড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেপক্ষে যোগ দেওয়া আদৌ উচিত কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা ১৯৫০-এর দশকে মিথ্যা অভিযোগে কমিউনিস্টদের হত্যার কাজে জেনারেল ম্যাক আর্থারের সপক্ষে মার্কিন জনমত সংগঠিত করা, প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উগ্রজাতীয়তাবাদী, অতি-রক্ষণশীল ও কমিউনিজমবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ ছিলেন উইলিয়াম হার্স্ট। তাঁর রাজনীতি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও উগ্র দক্ষিণপন্থী।

১৯৩৪ সালে তিনি জার্মানি যান। হিটলার তাঁকে অতিথি ও বন্ধুর মর্যাদা দেন। হার্স্টের এই জার্মানি ভ্রমণের পর থেকেই তাঁর মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি আরও খোলাখুলিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রায় এমন কোনও দিন ছিল না, যেদিন সেসব সংবাদপত্রে সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বা বিশেষ করে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। হার্স্ট এই সময় তাঁর মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলিকে প্রায় নাৎসিদের নিজস্ব প্রচারপত্র করে তোলারও চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই সেখানে গোয়েরিং-এর লেখা প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশ করা শুরু হয়। কিন্তু নানা পাঠক এই ব্যাপারে তাঁদের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করায় শেষপর্যন্ত এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করা বন্ধ করতে হয়।

হিটলারের জার্মানি থেকে ঘুরে আসার পর থেকেই হার্স্টের সংবাদপত্রগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রতিদিন একের পর এক ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে — তার কোনওটি খুনের, কোনওটি নির্বিচার গণহত্যাকাণ্ডের, আবার কোনওটি বা বাধ্যতামূলক দাসত্বের, শাসকদের বিপুল বিলাসবৈভবের, বা সাধারণ মানুষের অভাব-দারিদ্র্য-অনাহারের। তাদের মতে, এইসবগুলিই ছিল সোভিয়েত শাসকদের চেপে রাখা তথ্য। প্রকাশিত সংবাদ-প্রবন্ধগুলিতে অত্যন্ত উত্তেজকভাবেই এই সব "সত্য" উদ্ঘাটন করা হত। প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত এইসব সংবাদ আসলে সরবরাহ করত নাৎসিদের কুখ্যাত 'গোপন রাষ্ট্রীয় পুলিশ' বা গেস্টাপো বাহিনী। প্রায়শই এইসব সংবাদপত্রের একেবারে প্রথম পাতাতেই সোভিয়েত সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা ও তাকে ভিত্তি করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হত। যেমন একটি ব্যঙ্গচিত্র ছিল যেখানে স্ট্যালিন একটি খোলা ছুরি নিয়ে যেন কাউকে হত্যা করতে উদ্যত। এইখানে কিন্তু একটা কথা আমাদের অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, এইসব সাজানো কথা, মিথ্যা কথা ও ব্যঙ্গচিত্রের পাঠকসংখ্যা কিন্তু ছিল শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই দৈনিক ৪ কোটি। এছাড়াও অন্যান্য নানা সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সারা পৃথিবীরই আরো কয়েক কোটি মানুষের কাছে এইসব সংবাদ পৌঁছে যেত। এই হল স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা প্রচারের সূচনা। (ক্রমশ)

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই দলের নামখানা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড বাবুল বারুই গত ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। কমরেড বাবুল বারুই ছোটবেলা থেকে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র, পেশায় ভ্যান চালক, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসাবে গ্রামের মানুষের প্রিয়জন ছিলেন। ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে শতাধিক মানুষের সাথে তিনিও সিপিএম থেকে বেরিয়ে এসে এস ইউ সি আই দলে যোগ দেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। বারবার তাঁকে দলে ফেরানোর জন্য সিপিএম নানা চাপ ও প্রলোভন সৃষ্টি করলেও অভাবী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে টলাতে পারেনি। বরং নিজে যুক্ত হওয়া শুধু নয়, তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয়স্বজন যাতে যুক্ত হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। দলের সমস্ত কর্মসূচিতে পরিবারের সকলকে নিয়ে আসতেন। দলের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কাজ করতেন না। সবাইকে বলতেন, দলই আমাদের গার্জেন, তাই যা কিছু করবে দলের মতামত নিয়ে করবে। তাঁর মতো সৎ নিষ্ঠাবান কর্মীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর মরদেহ পার্টি অফিসে নিয়ে এলে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাদার লস্কর, লোকাল সম্পাদিকা কমরেড প্রতিভা মিশ্র সহ অন্যান্য কমরেডরা মাল্যদান করেন। ১২ মার্চ তাঁর স্মরণসভা নামখানা পার্টি অফিসে অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড বাবুল বারুই লাল সেলাম

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অঙ্গীকার

তিনের পাতার পর

তাই মানুষের সংস্কৃতি কখনও সমাজবিমুখ বা সামাজিক দায়বদ্ধতাহীন হতে পারে না। অথচ কী অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছে এ রাজ্যে যে এখনও বহু মানুষ কোন কিছুর প্রত্যাশায় অথবা কোন আশঙ্কায় চুপ করে আছেন। এই নীরবতা আমাদের ব্যথিত করছে। শিল্প - সাহিত্য - শিক্ষা - বিজ্ঞানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি সংবেদনশীলতা বা মানবিকতার উজ্জীবন না দেখা যায় তাহলে তা বেদনার উদ্রেক করে। আজ যদিও প্রতিবাদ করার অধিকার ক্ষমতাসীন শাসকদল মেনে নিচ্ছে না এবং সমস্ত রকম প্রতিবাদী প্রচেষ্টার উপর নামিয়ে আনছে দমননীতি, তবু আজ এই মহতী সভার উপলব্ধি এই যে অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদ করার মধ্যেই যে মনুষ্যধর্মের সার্থকতা এই সার সত্য অনুভব করেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সত্ত্বেও সিঙ্গুরে প্রবল প্রতিবাদ চলছে। ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামের মানুষ সুসংহত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দ্বারা সাময়িকভাবে হলেও সরকারের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার অপচেষ্টা রুখে দিয়েছেন।

এই সভা মনে করে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা সুশীল সমাজ ও সুস্থ সংস্কৃতির উপাসক, তাঁদের দলমত নির্বিশেষে একটি মঞ্চে সংঘবদ্ধ হয়ে সক্রিয় প্রতিবাদে সামিল হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, আজকের পরিস্থিতি আমাদের কাছে বিবৃতি বা সহানুভূতিসূচক কথার অতিরিক্ত সক্রিয় ভূমিকা দাবি করে। এই লক্ষ্য থেকেই একটি মঞ্চ গড়ে তোলার ব্যাপারে এই সভা সহমত পোষণ করে এবং যাঁরাই এই প্রয়াসের মধ্যে আন্তরিকতা ও যথার্থতা দেখতে পাবেন তাঁদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকেরই কোন না কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকতে পারে — কিন্তু এই মঞ্চের কোন দলীয় রঙ নেই — মানবতার রঙ ব্যতীত।

এই মঞ্চ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, মানবতার অপমানে গর্জে উঠুক। এই মঞ্চ চায় সমাজের সর্বস্তরে যে কোন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। নাটক-গান-ছবি-চলচ্চিত্র-শিক্ষা-বিজ্ঞান সকল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের এই ভাষা ও চেতনা সমাজে সঞ্চারিত করতে হবে এই মঞ্চকেই। আসুন এই বার্তা আমরা সকলের কাজে পৌঁছে দিই।

এই কনভেনশন অঙ্গীকার করছে —

১। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও মানবতা লঙ্ঘনের ঘটনা যেখানেই ঘটবে তার প্রতিবাদ জানানো হবে;

২। সমস্ত মানুষের মধ্যে এই প্রতিবাদের ভাষা ও চেতনা সঞ্চারিত করা হবে;

৩। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন একটি সুশীল সমাজ গড়ে তোলার মূল লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে; এবং

৪। এই মঞ্চের বক্তব্য ও কর্মধারা সম্পর্কে সকলকে অবহিত রাখার জন্য একটি মুখপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এসপ্ল্যানেডের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রতিভা মুখার্জী

মহামিছিলে সামিল পথচলতি মানুষও

চারের পাতার পর

গড়ে তুলে লড়াই চালাচ্ছেন তাঁরা। গুরুপদবাবু বললেন, ‘‘আজকের এই মহামিছিল আমাদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে।’’

চা বাগানের শ্রমিকরা হাঁটছিলেন মিছিলে। ত্রিহানা চা বাগানের কর্মী জ্যোতি রাই জানালেন, ‘‘বাগান ভাল চলছে না। সাপ্তাহিক রেশন দিচ্ছে না, পেমেন্ট দিচ্ছে না, অসুস্থ মানুষ ওষুধ পাচ্ছে না’’। বললেন, ‘‘আমরাও বাগানে আন্দোলন চালাচ্ছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়ব।’’ তাঁদের সাথে এসেছেন কলেজ ছাত্রী শোভা গুরুং।

মিছিলে পথ হাঁটছিলেন সিঙ্গুরের কৃষক-খেতমজুর, কৃষক-রমণীরা। তাঁদের কারও বুকে লেখা ‘সিঙ্গুরের কৃষক’, কারও বুকে ‘সিঙ্গুরের খেতমজুর’। ভিড়ের মধ্যে সহজেই চিনে নেওয়া যাচ্ছিল সংগ্রামী এই মানুষগুলিকে। মিছিলে হাঁটছিলেন জমিরক্ষা আন্দোলনের নেতা তপন দাস, কর্মী চৈতালী ভট্টাচার্য, অমিতা বাগ, যূথিকা পাল প্রমুখ। সরকার এবং টাটার যৌথ আক্রমণের সামনে জমিরক্ষার যে লড়াই তাঁরা আজও চালিয়ে যাচ্ছেন, তারই ছাপ তাঁদের চোখেমুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, যা সঞ্চারিত হয়ে উঠছিল মিছিলে অংশগ্রহণকারী আশপাশের মানুষগুলির মধ্যেও। মিছিলের শুরু থেকেই ছিলেন সিঙ্গুরে বর্বর পুলিশি আক্রমণে নিহত শহীদ রাজকুমার ভুলের মা মীরা ভুল। সন্তানহারা এই মায়ের উপস্থিতি মিছিলকে অনুপ্রাণিত করছিল।

সন্ত্রাস কবলিত নন্দীগ্রামে এদিনও সিপিএম-এর ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক কিশোরী ও এক গৃহবধূ। তাই সংগ্রামী নন্দীগ্রাম থেকে আসতে পারেননি বেশি মানুষ। ভূমিরক্ষা আন্দোলনের নেতা ভবানীপ্রসাদ দাস, নন্দ পাত্রের সাথে এসেছিলেন প্রভাত সামন্ত, গৌরহরি দাস, নগেন্দ্র নাথ পাত্র, তারাপদ পাত্র আর সমীরণ গিরি-রা। কিন্তু এলাকায় সিপিএম দুষ্কৃতীদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে মিছিল শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের ফিরে যেতে হয়। প্রভাত সামন্ত জানিয়ে গেলেন, সিপিএমের শত আক্রমণেও নন্দীগ্রামের মানুষ ভয় পায়নি। জমিরক্ষার আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেই রয়েছেন তাঁরা। বাইরে সিপিএমের আক্রমণ, ভেতরে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা, এসবেরই মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবেন তাঁরা। জানিয়ে গেলেন, বাড়ছে এস ইউ সি আই দলের নীতি-আদর্শ ও সংগ্রামের একাগ্রতার প্রতি আস্থাও। ফিরে যাওয়ার আগে জেনে গেলেন, নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরের লড়াই শুধু তাঁদের একার লড়াই নয়, মহামিছিল দেখিয়ে দিয়েছে, গোটা পশ্চিমবাংলা আজ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

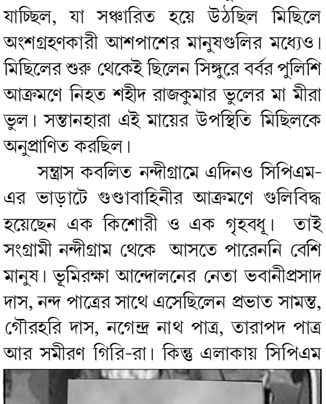

মিছিল যত এগিয়েছে ততই তার আয়তন বেড়েছে। দোকান কর্মচারী, হকাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নেমে মিছিলের পায়ে পা মিলিয়েছেন। লিফলেট পেয়ে, দেওয়াল লিখন দেখে অজানা, অচেনা বহু সাধারণ মানুষ মিছিলে এসে যোগ দিয়েছেন।

মিছিলের এই তেজ, দৃঢ়তা কেমনভাবে সঞ্চারিত হচ্ছিল রাজপথের দু’দিকে ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষের মধ্যে ? বিবেকানন্দ মোড়ে সাইকেল নিয়ে মিছিলে আটকে পড়েছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রদীপ দে। বললাম, ‘‘আটকে পড়ায় আপনার তো ক্ষতি হয়ে গেল।’’ এতটুকুও ইতস্তত না করে উত্তর দিলেন, ‘‘বড় কিছুর স্বার্থে একটু স্যাক্রিফাইস তো করতেই হয় ভাই’’। আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইলে বললেন, ‘‘কৃষিও চাই, শিল্পও চাই ; কিন্তু কৃষিজমিতে শিল্প হওয়া উচিত নয়।’’ বললাম, সরকার তো বলছে তারা জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে, তাই তারা যা করছে তাতে জনমত তাদেরই পক্ষে। তাঁর মুখে ফুটে উঠল একরাশ ঘৃণা, বললেন, ‘‘তখন কি মানুষ জানত যে, সরকারে গিয়ে তারা মানুষের সাথে বেইমানি করবে?’’

শ্রীমানি মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিছিল দেখছিলেন একদল মানুষ। পরিচয় নিয়ে জানা গেল, তাঁরা কেউ দোকান কর্মচারী, কারও বা বাজারে ছোট দোকান আছে। চোখে-মুখে অদ্ভুত তৃপ্তি ঝরে পড়ছিল তাঁদের। তাঁরা এমন একাগ্র হয়ে শুনছিলেন, মনে হচ্ছিল, যেন তাঁদেরই জীবনের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা-বঞ্চনাই স্লোগানের রূপে ভেসে আসছে মিছিল থেকে, তাঁদের মনের কোণে জমে থাকা আকাঙক্ষাগুলি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে মিছিলে উত্থিত দাবিগুলির মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, ছোট দল এস ইউ সি আই পারবে কি দাবি আদায় করতে? সমস্বরে উত্তর দিলেন, ‘‘নিশ্চয়ই পারবে; পারলে একমাত্র ওরাই পারবে।’’ দৃঢ়তার সাথে জানালেন চল্লিশোর্ধ্ব সুবোধ স্বর্ণকার — ‘‘এস ইউ সি আই আর ছোট নেই, দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বড় হয়েছে। আমরা এস ইউ সি আই-কেই সমর্থন করি।’’

ঠিক একই সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল মেডিকেল কলেজের পাশে ইডেন হাসপাতাল রোডের মুখে এক জটলায়। এক বাস ড্রাইভার অন্যদের উদ্দেশে বলে চলেছেন, ‘‘এরাই প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছে, এরাই বিদ্যুতের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে’’। তারপর মিছিলের উদ্দেশে বললেন, ‘‘এরা আজ সবার সহানুভূতি নিয়ে নিয়েছে। আমরা কেউ এস ইউ সি আই করি না, কিন্তু সকলেই আজ এস ইউ সি আই-কে সমর্থন করছি।’’

এমার্জেন্সি গেটের সামনে এক ব্যক্তি মিছিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে অন্যদের উদ্দেশে বলছেন — ‘‘দ্যাখো, দ্যাখো, মিছিলে কোথাও একজনও ধূমপান করছে না, কেমন সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে সকলে !’’

এই মিছিল মানুষকে উদ্বেল করেছে, হতাশার মাঝে মানুষ মিছিলকারীদের চোখের আলোয় আশার ভবিষ্যত দেখেছেন। তাই প্রৌঢ় এক পথচারীর আবেগপ্রবণ গলায় ফুটে উঠল — ‘‘সিপিএম ছিল সবচেয়ে বড় পার্টি ; আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, এই এস ইউ সি আই পার্টি শিগগীরই সবচেয়ে বড় পার্টি হবে।’’

মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে এলে দেখা গেল, রাস্তার ধারে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মিছিলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন, কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত। পাশে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান সহ দলের অনেক প্রবীণ নেতা-কর্মী এবং বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি।

তিনটি ম্যাটাডোরে ১ কোটি ২১ লক্ষ ৩৫ হাজারেরও বেশি স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে

আটের পাতায় দেখুন

মহামিছিলের পুরোভাগে নেতৃবৃন্দ, (বাঁ দিক থেকে) কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (বাঁদিক থেকে) কমরেড অনিল সেন, কমরেড ইয়াকুব পৈলান ও কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

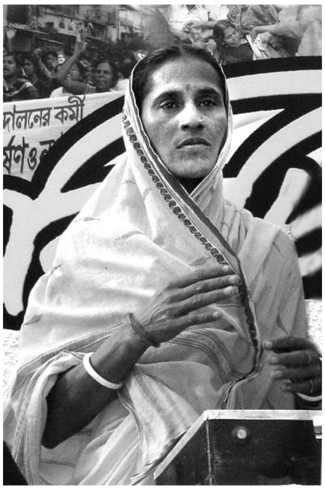

মহামিছিলে সামিল শহীদ রাজকুমার ভুলের মা মীরা ভুল এসপ্ল্যানেডের মঞ্চে

মহামিছিলে জনস্রোত

সাতের পাতার পর

মিছিল এসপ্ল্যানেডে পৌঁছালে জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। মিছিলের এক বিরাট অংশ এস এন ব্যানার্জী রোড থেকে তখনও বেরোতেই পারেনি। তারা সেখানেই পথের উপর বসে পড়ে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জওহরলাল নেহেরু রোড, ধর্মতলা এলাকা। মেট্রো চ্যানেলের মঞ্চে তখন উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড প্রতিভা মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বললেন, এই মিছিল রাজ্যের সমস্ত জনগণকে উৎসাহ দিয়েছে। রাজ্যের এমন কোনও জেলা নেই যেখান থেকে আজ হাজারে হাজারে মানুষ আসেনি। তিনি সরকার এবং সরকারি দল প্রসঙ্গে বললেন, ওদের হাতে পুলিশ আছে বলে ওরা ভেবেছে গায়ের জোরে জমি দখল করে নেবে। ওরা দেওয়ালের লেখা পড়তে শেখেনি। ওরা জানে না, সঠিক নীতি-আদর্শকে ভিত্তি করে, সঠিক নেতৃত্বে মানুষ যখন জেগে ওঠে, তখন তাকে লাঠি-গুলি দিয়ে দমন করা যায় না, তখন এমন কোনও শক্তি থাকে না, যা তাদের হঠিয়ে দিতে পারে। তিনি বলেন, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে গেছে, আমরা সর্বত্র গণকমিটি গঠন করে সংগ্রাম পরিচালনা করছি। এই লড়াইয়ে সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল— সব দলের নিচুতলার কর্মীরা আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, অন্যান্য সব দল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, টাটা-সালিমদের বিরুদ্ধে কথা বলে না, শুধু সিপিএমের বিরুদ্ধে বলে। রাজ্যের ক্ষমতা দখল তাদের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে এস ইউ সি আই ভোটের রাজনীতি করে না। একটার পর একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মূল শত্রু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত করাই তার প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে। পুঁজিপতিশ্রেণী যে নীতিতে দেশ চালাচ্ছে, তা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে আন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারব না। তিনি মহামিছিলকে আন্দোলনের একধাপ অগ্রগতি হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, যতদিন না দাবি আদায় হয়, এ লড়াই চলবে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু শহীদ রাজকুমার ভুলের জননী মীরা দেবীকে মঞ্চে আহ্বান জানালে আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে গোটা সমাবেশ। সঙ্গীতগোষ্ঠীর কণ্ঠে তখন বেজে ওঠে — 'আকাশ কান্দে, বাতাস কান্দে, কান্দে মায়ের প্রাণ / সিঙ্গুরের মাটি কান্দে, কান্দে সোনার ধান....'

মিছিল শেষে ফিরে চলেছেন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ। মনে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার — এই চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে আরও বহু মানুষের মধ্যে, গড়ে তুলতে হবে আরও হাজার হাজার গণকমিটি। আন্দোলনের, লড়াইয়ের বাংলা আবার নতুন শক্তিতে জেগে উঠছে।

শোকদিবস পালনের আহ্বান

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

"বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ার ৭০ বছরের বৃদ্ধ হারাধন বাগ বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ২ বিঘা ১৫ কাঠা চাষের জমি সরকার কেড়ে নেওয়ায় সিঙ্গুরের ১১ মার্চ রাত ১১টায় আত্মহত্যা করেন। পুলিশ ও সশস্ত্র সমাজবিরোধী শক্তির জোরে সিপিএম সরকার চাষীর রুজি-রোজগারের একমাত্র সম্বল কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে টাটাকে দিচ্ছে। কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬ প্রয়াত হারাধন বাগের পুত্রবধূ ও আড়াই বছরের নাতনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে হাজতবাস করেন।

"গরিব চাষীর একমাত্র সম্বল কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার নির্মম পরিণতি এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন তীব্রতর করার অঙ্গীকার নিয়ে আগামী ১৪ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র শোকদিবস পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

জনসমুদ্র ধর্মতলা (ছবি - অলোক দে'র সৌজন্যে)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in